CGS Occasional Papers
সিজিএস আলোচনাপত্র

বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি

আলী রীয়াজ

Centre for Governance Studies
সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ

সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করে এবং এই সব বিষয়ে একাডেমিক পরিসর, সরকার, ব্যক্তিখাত, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। বিস্তারিতের জন্যে দেখুন - http://cgs-bd.com/

সিজিএস আলোচনাপত্র-এ সমকালীন নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে আলোচনা, গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল, নিবন্ধ, সেমিনার ও সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং চলমান গবেষণার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করা। আলোচনাপত্রে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট গবেষকের।

সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ
৪৫/১ নিউ ইস্কাটন রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ

সিজিএস আলোচনাপত্র ১: বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি, আলী রীয়াজ, অক্টোবর ২০১৮
CGS Occasional Papers 1: Future Trends of Bangladeshi Politics, Ali Riaz, October 2018

বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ এখন এমন এক রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে যে সংকট অতীতের যে কোন ধরণের সংকটের চেয়ে ভিন্ন এবং গভীর। এই নিবন্ধে সেই সংকটের গভীরতা ব্যাখা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা চিহ্নিত করার জন্যে চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে; সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে বিরাজমান শাসনের রূপ, বাংলাদেশের সমাজে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের প্রতিক্রিয়া, সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের প্রভাব এবং ভারতের ভূমিকা। বাংলাদেশের বিরাজমান শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যত গণতান্ত্রিক উপাদানের পাশাপাশি শক্তিশালী কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার উপস্থিতি এবং শাসন পরিচালনার জন্যে শক্তি প্রয়োগের ওপরে নির্ভরতা। একে এই নিবন্ধে হাইব্রিড রেজিম বা দোআঁশলা শাসন ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে সমাজে নতুন শ্রেণী বিন্যাস ঘটেছে। রাষ্ট্রের আনূকূল্যে ও ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই শ্রেণীর মধ্যে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার আকাঙ্খার ঘাটতি আছে, যা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের প্রভাব বেড়েছে এবং আগামীতে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির ক্ষেত্র যতই সীমিত হবে, এই শক্তির প্রভাব ও ক্ষমতা বাড়বে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব ক্রমবৃদ্ধিমান এবং সব প্রধান রাজনৈতিক দলই তা মেনে নিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতির ভারত এক নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র সরকার চায়, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কারণে এখন তা আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এতে করে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের লাভবান না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

লেখক পরিচিতি

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। তিনি ২০০৭ থেকে ২০১৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও সরকার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ২০০২ সালে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়ার আগে তিনি বাংলাদেশে, ইংল্যান্ডে এবং সাউথ ক্যারোলিনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি লন্ডনে বিবিসিতে সাংবাদিকতা করেছেন পাঁচ বছর। ২০১৩ সালে ড. রীয়াজ ওয়াশিংটনের উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারস-এ পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, মাদ্রাসা শিক্ষা, রাজনৈতিক ইসলাম, এবং সহিংস উগ্রবাদ। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *আনডায়িং ইস্যুজ (২০১৮), লিভড ইসলাম এ্যান্ড ইসলামইজম ইন বাংলাদেশ (২০১৭), বাংলাদেশ: এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স (২০১৬)*। বাংলায় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে *ভয়ের সংস্কৃতি: বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি (২০১৪)*।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নিবন্ধটি ৬ জুলাই ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডিং ক্লাব ট্রাস্ট ও জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণবক্তৃতা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই জন্যে লেখক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠানের সভা প্রধান অধ্যাপক রওনক জাহান এবং উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনীতি আগামীতে কোন পথে যাবে সেই বিষয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে, উদ্বেগ আছে এবং আশংকাও আছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তা কোনো নতুন বিষয় নয়; গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ বারবার রাজনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৯১ সালে দেশে নির্বাচিত বেসামরিক শাসন চালুর পরে আশা করা হয়েছিলো যে এই ধরণের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ১৯৯৬, ২০০৬ এবং ২০১৪ সালে আমরা আবারও এই ধরণের অনিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ করেছি। এই অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ আপাতদৃষ্টে আসন্ন নির্বাচন-কেন্দ্রিক - সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত এই বছর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কীনা, কী ধরণের নির্বাচন হবে, কাদের অংশগ্রহণে এই নির্বাচন হবে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কীনা এই সব প্রশ্নই সাধারণত আলোচনা হয়ে থাকে। এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কেন এই সব প্রশ্ন ওঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ না করলে এই সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বোঝা যাবেনা। অতীতে বাংলাদেশ যত ধরণের রাজনৈতিক সংকট বা অনিশ্চয়তার মোকাবেলা করেছে এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার আপাত সাদৃশ্য থাকলেও এবারের সংকট অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন এবং এই সংকট আরো গভীর।

এই সংকট কেন গভীর তা উপলব্ধি এবং বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা চিহ্নিত করতে চাইলে আমাদের চারটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে বিরাজমান শাসনের রূপ, বাংলাদেশের সমাজে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের প্রতিক্রিয়া, সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের প্রভাব এবং ভারতের ভূমিকা।

বাংলাদেশের বিরাজমান শাসনের রূপ

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেবল জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন হয়নি, তা তৈরি করেছিলো একটি অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। স্বল্প সময়ের একদলীয় ব্যবস্থা, দেড় দশকের প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন ও বেসামরিক সরকারের মোড়কে সামরিক শাসন সব মিলে প্রায় দুই দশক ধরে চালু থাকা কর্তৃত্ববাদী ধরণের শাসনের অবসান ঘটেছিলো এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলের কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন হয়েছিল এমন দাবি করার কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু একথা অতিরঞ্জন নয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে লোকরঞ্জনবাদী কর্তৃত্ববাদ (পপুলিস্ট অথরিটারিয়ানইজম) এবং সামরিক কর্তৃত্ববাদের যে ইতিহাস তা থেকে বেরুবার আকাঙ্খা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো। সাধারণত কর্তৃত্ববাদী শাসনের কেন্দ্রে থাকেন একজন ব্যক্তি, কিন্তু এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলে, যা সবার অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ফলে, সারা পৃথিবীর গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যে কোনো দেশেই কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের হলেই সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনে করার কারণ নেই।

১৯৭০-এর দশকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, নীতি-নির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্র বলতে নির্বাচনের ওপরেই বেশি জোর দিতেন। যে কারণে সেই সময়ে দেশে দেশে স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী শাসকেরাও নির্বাচনের আয়োজন করে নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে জাহির করার চেষ্টা করেছেন, সামরিক শাসকদেরও

'গণতান্ত্রিক' বলে বর্ণনা করার ঘটনা দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এটা স্পষ্ট হয় যে, নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; কিন্তু নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। নির্বাচনের ওপরে অতিরিক্ত জোর দেয়াকে কেউ কেউ 'ফ্যালাসি অব ইলেক্টোরালইজম' বলে বর্ণনা করলেন (স্মিটার ও কার্ল ১৯৯১)। অনেকেই এই বিষয়ে উৎসাহী হলেন যে কর্তৃত্ববাদ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ কী? আর কেউ কেউ দেখতে চাইলেন উত্তরণের পর কীভাবে সেখানে গণতন্ত্র সংহত হয়।

এই সব আলোচনার সূচনা পর্বেই ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় স্যামুয়েল হান্টিংটন দেখান, শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইতিহাসে তিন দফা গণতন্ত্রের প্রসার হয়েছে; একে তিনি বলেন 'গণতন্ত্রের তিন ঢেউ' (হান্টিংটন ১৯৯১)। তিনি বলেন, প্রতিটি ঢেউয়ের পরেই এসেছে ভাটার টান। প্রথম ঢেউয়ের ঘটনা ১৮২৬ থেকে ১৯২৬ সাল। দ্বিতীয় ঢেউ দেখতে পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, যার শেষ হয়েছে ১৯৬২ সালে। তৃতীয় ঢেউয়ের সূচনা হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৯১ সালে তাঁর গবেষণার শেষে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে খুব শিগগির ভাটার টান আসবে। তাঁর 'তিন ঢেউ তত্ত্বের' সমর্থন পাওয়া গেলো তথ্যের মধ্যেই। ১৯৭৩ সালে সারা পৃথিবীর মোট দেশের এক-চতুর্থাংশ ছিল গণতান্ত্রিক, ১৯৮০ সালে তা দাঁড়ায় এক-তৃতীয়াংশে এবং ১৯৯২ সালে প্রায় অর্ধেকে। নব্বইয়ের দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে একদলীয় শাসনের অবসান থেকে এটাই বোঝা গেলো যে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এই সময়ে অনেকেই বিস্মৃত হলেন যে, জোয়ারের শেষে আসে ভাটার টান। ১৯৮০-এর দশকে গণতন্ত্রায়ন নিয়ে আশাবাদের জোয়ারের মধ্যেও উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ, যেমন গুয়েলারমো ও'ডানেল এবং ফিলিপ স্মিটার, ১৯৮৬ সালে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে উত্তরণের ফল হতে পারে তুলনামূলক উন্মুক্ত কর্তৃত্ববাদী শাসন অথবা নিয়ন্ত্রণমূলক অনুদার (Illiberal) গণতন্ত্র (ও'ডানেল এবং স্মিটার ১৯৮৬: ৯)। তাঁদের এই উদ্বেগ গবেষকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো ২০০০-এর দশকে এসে। দেখা গেলো যে, এই 'নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলো'র অনেকেই গণতন্ত্রের পথে খুব বেশি অগ্রসর হয়নি, অর্থাৎ সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিতভাবে, নাগরিকেরা সীমিতভাবে অধিকার পাচ্ছেন এবং যদিও অধিকাংশ দেশ আগের স্বৈরাচারী বা প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় ফিরে যায়নি (কয়েকটি দেশে যদিও আবার পুরোনো ব্যবস্থা ফিরেও এসেছিল), কিন্তু এসব দেশে বড়জোর নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু এর বাইরে গণতন্ত্রের আর কোনো দিকই বিকশিত হচ্ছে না। কেউ কেউ এই রকম আশা করলেন যে, এগুলো আসলে উত্তরণের পথে আছে।

এই ধরণের ব্যবস্থাকে কী বলা যায় এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এইসব বিশেষণের মধ্যে রয়েছে আধা গণতন্ত্র (Semi-democracy), প্রায়-গণতন্ত্র (Virtual democracy), নির্বাচনী গণতন্ত্র (Electoral democracy), ছদ্ম গণতন্ত্র (Pseudo-democracy), অনুদার গণতন্ত্র (Illiberal democracy), আধা কর্তৃত্ববাদ (Semi-authoritarianism); কোমল কর্তৃত্ববাদ (Soft authoritarianism) এবং নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ (Electoral authoritarianism) (লেভিটস্কি এবং ওয়ে, ২০০২)। ল্যারি ডায়মন্ড এই ধরনের বিভিন্ন শাসনকে একত্রে হাইব্রিড রেজিম (Hybrid Regime) বা সংকর/ দোআঁশলা শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন (ডায়মন্ড, ২০০২)।

গোড়ার দিকে এসব শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 'আধা', 'প্রায়' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করে একে গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদী শাসনের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্তর বলে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হলেও পরবর্তী সময় বিশেষজ্ঞরা ক্রমেই স্বীকার করে নেন যে এগুলো গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদের কোনো উপরূপ নয়। বরং এগুলো হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের শাসন,

নিজেই একটা বিশেষ রূপ। ফলে এদের গণতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদ বলে বর্ণনার সুযোগ নেই (বোগার্ড ২০০৯)। ল্যারি ডায়মন্ড ২০০২ সালে খুব জোর দিয়ে বলেন যে হাইব্রিড রেজিম বা 'দোআঁশলা শাসন'কে উত্তরণের পথে রয়েছে এমন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। উত্তরণ পর্যায় হচ্ছে শাসনব্যবস্থা এক ধরন থেকে অন্য ধরনে যাওয়ার অন্তর্বর্তী অবস্থান হাইব্রিড রেজিম তা নয়, এগুলো নিজেই একধরনের শাসনব্যবস্থা। এই ধরণের ব্যবস্থার নির্ধারক চরিত্র হচ্ছে যে, এগুলোতে একই সময়ে গণতন্ত্রের কিছু, আর স্বৈরতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় দু'টি; প্রথমত একে এক বিশেষ ধরণের সরকার না বলে 'রেজিম' বলা হয়েছে; দ্বিতীয়ত হাইব্রিড রেজিম এই ধারণার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, এটা একটি মাত্র শাসন ব্যবস্থা নয়। রেজিম বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এগুলো যে কোনো সরকারের চেয়ে বেশি স্থায়ী ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন 'more permanent form of political organization' (ফিশম্যান ১৯৯০)। যে কোনো রেজিম আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, ক্ষমতার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। রেজিম নির্ধারণ করে ক্ষমতায় কার প্রবেশযোগ্যতা থাকবে, আর কার থাকবে না। এই ধরণের রেজিমে বেশ কয়েক ধরণের শাসন থাকতে পারে সেটা নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক আছে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কি ধরণের বোঝাপড়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের পরে যে ব্যবস্থা তৈরি হয় তাঁকে আমরা ইলেকটোরাল ডেমোক্রেসি বা নির্বাচনী গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করতে পারি। এই ধরণের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন, বহু দলের উপস্থিতি, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার, নিয়মিত গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে বড় ধরণের জালিয়াতির অনুপস্থিত এবং যাতে জনমতের প্রতিফলন ঘটে; যেখানে গণমাধ্যম এবং নিয়ন্ত্রণহীন নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে বড় দলগুলোর ভোটারদের কাছে যাবার সুযোগ আছে (ফ্রিডম হাউস ২০১২)। এই ব্যবস্থাটা চালু হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীর হাতে এমন ক্ষমতা অর্পণ করে যা ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের সুযোগ বহাল রাখে এবং গোটা ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে 'প্রধানমন্ত্রীর শাসন' ব্যবস্থা। তদুপরি, বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিষয়ে যে অস্পষ্টতা যা ১৯৭২ সালের সংবিধানে ছিলো তাই বহাল থাকলো।

সাংবিধানিক বিধিবিধান, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন) গঠনে অনুৎসাহীতা, দলের ভেতরে গণতন্ত্রহীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করে দল ও ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই ব্যবস্থাটিতে ক্রমেই অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধান হয়ে ওঠে। দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উপস্থিতি এবং ক্ষমতার হাত বদলের মধ্য দিয়ে শাসনের রূপ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্তৃত্ববাদ বা কমপিটিটিভ অথরিটারিয়ানইজম। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে যে ক্ষমতাসীনদের কাজের বৈধতা তৈরি হয় একমাত্র নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়েই, সেই নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হল কিনা সেটা আর বিবেচ্য থাকে না (কিলিঞ্চ ২০১৭)। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বা ২০০৬ সালের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা তাই প্রমাণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) উপলব্ধি করলো যে এই ব্যবস্থার ভিত্তি এবং যেই ক্ষমতায় থাকুক তার বৈধতার ভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন।

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর, বিশেষ করে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর পর, বাংলাদেশে নতুন ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। অন্যান্য দেশে বিরাজমান এই ধরণের ব্যবস্থা নিয়ে এড্রিয়াস স্যাডলার বলেছেন, এই ব্যবস্থায় যা চলে তা 'বহুদলীয় রাজনীতির খেলা' এবং নির্বাচন গণতন্ত্রের নয়, কর্তৃত্ববাদের হাতিয়ারে পরিণত

হয় (স্যাডলার ২০০৬)। ২০১৪ সালে বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষে এই ধরণের ব্যবস্থা সহজেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলেই তা ভিন্ন হত কিনা, কিংবা এর কারণ ২০১৫ সালের গোড়াতে বিএনপি'র সহিংস আন্দোলন কিনা সেটা এখন প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরপরই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিএনপি'কে আর কোনভাবেই রাজনীতিতে জায়গা দিতে আগ্রহী নয়। ২০১৫ সালে ১ জানুয়ারি প্রকাশিত 'দেয়ার ক্যান বি অনলি ওয়ান' (কেবল এক পক্ষই থাকতে পারবে) শিরোনামের এক নিবন্ধে জাফর সোবহান সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, 'ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গেম প্ল্যান খুব স্পষ্ট। আগামী বছরে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা খুব সোজাসাপ্টাঃ চেপে ধরে বিএনপি'র প্রাণবায়ু বের করে ফেলা অব্যাহত রাখা' (সোবহান ২০১৫) (তাঁর ভাষায়, The game plan for the ruling Awami League is clear. The AL plan for the coming year is therefore straightforward: Continue to squeeze life out of the BNP.) ১৯৮২ সালের পর থেকে এই দুই দলের মধ্যে যে অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতা ছিলো তা ছিলো কার্যত সেনা-আমলাতন্ত্রের বিপরীতে বেসামরিক রাজনৈতিক দলের শাসন প্রতিষ্ঠার। ২০০৯ সালের পরে সেটার আর কোনো তাগিদ থাকেনি। তদুপরি যে কোনো হাইব্রিড রেজিম অবশ্যই নির্বাচন করতে চায় কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কখনো চায় না যে এমন প্রতিপক্ষ উপস্থিত থাকুক যা তাকে পরাজিত করতে পারবে এমন সম্ভাবনা আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পরে এমন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে যেখানে ক্ষমতাসীনরা পরাজিত হবেন। বাংলাদেশের অতীত নির্বাচনের ইতিহাসই কেবল সেই সাক্ষ্যই দেয় না, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তা আসলে যে কোনো হাইব্রিড রেজিম বা দোআঁশলা ব্যবস্থায় যা হয় তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ইকনোমিস্ট ইন্টিলেজিন্স ইউনিটের হিসেব অনুযায়ী, পৃথিবীর ১৬৭টি দেশের মধ্যে ৩৭টি দেশের অবস্থাই এই রকম; পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬.৭% মানুষ এখন এই ধরণের ব্যবস্থার অধীন। সারা পৃথিবীতেই এখন গণতন্ত্রের পিছু হটার ঘটনা ঘটছে। রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, ফিলিপাইন, তুরস্ক, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া এর সহজে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৯৯০-এর দশকে যখন গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে কিছু দেশ এই ধরণের ব্যবস্থায় উপনীত হল তখন অনেক আশাবাদী গবেষক, বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন যে এই ধরণের দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থা সম্ভবত আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হবে, অন্যরা একে এক ধরণের নিশ্চল ব্যবস্থা বলেই মনে করতেন, মনে করতেন যে স্থিতাবস্থা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু গত দুই দশকের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে বলা যায় যে এগুলো নিশ্চল নয়, হাইব্রিড রেজিমের পরিবর্তনের পথরেখা গণতন্ত্র অভিমুখী নয়, বরঞ্চ কর্তৃত্ববাদের দিকেই।

যে কোনো হাইব্রিড রেজিমকে টিকে থাকার জন্যে দরকার হয় তিনটি ক্ষেত্রের ওপরে নিয়ন্ত্রণ সেগুলো হচ্ছে নির্বাচন, নির্বাহী ও আইন সভা, এবং বিচার ব্যবস্থা (লেভিতস্কি এবং ওয়ে ২০০২; একম্যান ২০০৯)। গবেষণায় এও দেখা যাচ্ছে যে নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা এবং বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র তৈরি হয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। যে কোনো হাইব্রিড রেজিমের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দরকার হয় আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জন, ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতার বা পেট্রনেজ নেটওয়ার্ক বজায় রাখা এবং তাঁদের অপরাজেয়তার প্রমাণ হিসেবে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, হাইব্রিড রেজিম, তুরস্ক বা রাশিয়া যে দেশেই হোক না কেন, নির্বাচনের আয়োজনের কথা তাঁরা জোর দিয়ে বলে, কিন্তু সেই নির্বাচন অবাধ এবং সরকারী প্রভাব মুক্ত হলো কীনা, সেই নির্বাচনের সততা বা ইন্টিগ্রিটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তাঁরা নীরবতা পালন করে থাকে।

এক্ষেত্রে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে এই ধরণের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা কী হয়া উচিত। কেউ কেউ মনে করেন যে এই ধরণের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমতাসীনদের বৈধতা প্রদান করে, ফলে তাঁরা নির্বাচন বর্জনের পক্ষে। কেউ কেউ মনে করেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই ক্ষমতাসীনদের ওপর চাপ তৈরি, জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে গণতন্ত্রায়নের সম্ভাবনা তৈরি করা যাতে পারে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাশিয়া, তুরস্ক এবং মালয়েশিয়ার নির্বাচনের শিক্ষাগুলো এ ক্ষেত্রে মনোযোগ দাবি করে। মালয়েশিয়ায় বিরোধী দল ও শক্তিগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল ক্ষমতাসীনদের পরাজিত করতে পেরেছে।

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের প্রশ্নটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে। সে সব দল ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছে তাঁদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া দরকার যে তাঁরা যে সব বিবেচনায় নির্বাচন বর্জন করেছিলেন তার কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা এবং অপরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তাঁরা নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা, নিলে কী বিবেচনা থেকে অংশ নেবেন। আগামী নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনায় দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অংশগ্রহণ করবে কিনা তা যথাযথ কারণেই বিশদভাবে আলোচিত হয়; বিএনপি'র ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালে কথিত আন্দোলনের কৌশল এবং সে সময়কার ঘটনা প্রবাহের দায় বিএনপি'কে বহন করতে হয়। কিন্তু আসন্ন নির্বাচন কী ধরণের হবে, আদৌ অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ হবে কী না সেই প্রশ্নটিকে কেবল বিএনপি'র অংশগ্রহণের প্রশ্ন, কিংবা দলের প্রধান খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে বিএনপি'র অংশগ্রহণের প্রশ্ন বলে আলোচনা করা সঠিক নয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকেই এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আলোচিত হওয়া দরকার যে, দোআঁশলা এই ব্যবস্থায় কী ভাবে একটি নির্বাচন করা সম্ভব যা জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে এবং নির্ভয়ে তাঁদের রায় প্রদান করতে পারবে। এই নির্বাচন কেবল অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষকদের সামনে অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয় তা স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে তাঁদের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণেই স্পষ্ট (আহমেদ, কামাল, ২০১৮)। একইভাবে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি'র ওপরেও এই দায়িত্ব বর্তায় যে তাঁরা একে কেবল দলীয় বিবেচনা থেকে বা দলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের সুযোগ হিসেবে দেখছে কীনা তা পরিষ্কার করা এবং সেই আলোকেই পদক্ষেপ নেয়া ।

সব হাইব্রিড রেজিমেই দৃশ্যত গণতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান থাকলেও হাইব্রিড রেজিম প্রধানত শক্তি প্রয়োগের ওপরে নির্ভর করে। শক্তি প্রয়োগের এই প্রবণতার ফলে রাষ্ট্রের নিপীড়ক যন্ত্রগুলো আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং তাঁদেরকে একধরনের দায়মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু হাইব্রিড রেজিম একই সঙ্গে তার পক্ষে সমর্থক গোষ্ঠীদের সমাবেশ ঘটায়, তাঁদেরকে শক্তিশালী করে, নাগরিকদের মধ্যে তাঁদের যে সমর্থন আছে তাকে বহুভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। এ জন্যে গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, মিথ্যা প্রচার, বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি।

বাংলাদেশে গত এক দশকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ যেমন নির্বাহী বিভাগ এবং আইন সভার ওপরে ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ২০১৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা না প্রতিনিধিত্বশীল, না কার্যকর। অতীতে সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ না হলেও যে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে পেরেছিলো গত চার বছরে তা অবসিত হয়েছে।

বাংলাদেশে এক সময় যে প্রাণবন্ত সিভিল সোসাইটি ছিলো আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। সিভিল সোসাইটিকে দলীয়করণের যে ধারা ১৯৯১ সালের পরে তৈরি হয়েছিল সেই সুযোগকে ব্যবহার করে, গত এক দশকে রাষ্ট্র এবং

ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে 'সিভিল সোসাইটি'র বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে প্রচার চালানো হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জবাবদিহির একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপরে ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের ভাষায় নির্বাচনে তাঁদের বিজয় 'আনুষ্ঠানিকতা' মাত্র (প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০১৮), সেহেতু আর সব ধরণের জবাবদিহির ব্যবস্থা চূর্ণ করে ফেলাই হচ্ছে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার উপায়। গণতান্ত্রিক সমাজে জবাবদিহির ব্যবস্থা যেমন সুষ্ঠু, অবাধ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, তেমনিভাবে আরো দুই ধরণের জবাদিহির ব্যবস্থা থাকে সাংবিধানিকভাবে তৈরি করা ক্ষমতাসীনদের প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান (যেমন দুর্নীতি কমিশন) যারা ক্ষমতাসীনদের ওপরে নজরদারী করতে পারেন, আর হচ্ছে সিভিল সোসাইটি যার মধ্যে আছে স্বাধীন গণমাধ্যম এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের অবস্থা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে যে এর সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক এবং নীতি-নির্ধারকরা দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে নিজেদের সিভিল সোসাইটির অংশ মনে করেন না, সিভিল সোসাইটির মানহানি (ভিলিফাই) করার কাজে তারাই অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ, স্বতঃপ্রণোদিত সেন্সরশিপ এবং দলীয় আনুগত্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যাতে করে গণমাধ্যমগুলো এখন সমাজের বৃহদাংশের কাছে কতটা আবেদন রাখেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

রাশিয়া, তানজানিয়া এবং ভেনেজুয়েলায় বিরাজমান হাইব্রিড রেজিমের টিকে থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একম্যান তাঁর গবেষণায় দেখান যে, দুর্বল বা অকার্যকর বিরোধী দল এবং দলগুলোর জনবিচ্ছিন্নতা অন্যতম কারণ। তিনি আরো দেখান যে, রাজনীতি বিষয়ে অনাগ্রহ বা হতাশা সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে (একম্যান ২০০৯)। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-ই শুধু নয়, অন্য দলগুলোর ভূমিকা এবং রাজনীতিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলার ফলে দলগুলোর আবেদন সীমিত হয়েছে। রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চেয়ে কম সফল তা সহজেই বোধগম্য। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের আচরণের কারণে দল-নির্বিশেষে রাজনীতিকেই দোষারোপ, তরুণদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি অনীহা তৈরি এবং এই ধারণা সৃষ্টি যে তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্য দেশের সার্বিক রাজনীতি থেকে আলাদা সেটা ইচ্ছে করেই তৈরি করে হয়েছে। সমাজে এখন যারা সক্রিয় আছেন তাঁদেরকে ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা এখন প্রতিদিনের বিষয়। সে কারণে বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং গুমকে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখুন, রীয়াজ ২০১৪)।

বাংলাদেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে হাইব্রিড রেজিম বলে চিহ্নিত করলে বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা অনুধাবন করা দুরূহ হয়না। ইতিমধ্যেই দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের যে প্রবণতা লক্ষ্য করেছি তার মাত্রা যে ক্রমবর্ধমান তাও সহজেই দৃষ্ট। শুধু তাই নয়, এই শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি কেবল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতেই সীমিত তা নয়, ক্ষমতাসীন দলের নিম্নতম স্তরের কর্মীদের মধ্যেও তা বিস্তার লাভ করেছে এবং সমাজের সর্বস্তরে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই দায়মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। বাংলাদেশের সমাজে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, সহিংসতার ব্যাপক বিস্তারের যে সব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কার বাস্তব ভিত্তি এইখানেই।

যেসব দেশে গণতন্ত্র ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে এবং ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে হাইব্রিড রেজিমের উত্থান ঘটেছে, সেখানেই ক্ষমতাসীনরা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে তাদের ক্ষমতায় থাকার যুক্তি হিসেবে, এক ধরণের আদর্শিক বাতাবরণ তৈরি করেছেন। এই সব আদর্শিক বাতাবরণের মধ্যে আছে

উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা, ধর্মীয় আদর্শ। এও দেখা গেছে যে, গত কয়েক এক দশকে যে সব দেশে এই ধরণের হাইব্রিড রেজিম তৈরি হয়েছে সেখানে এক ধরণের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে (মাহমুদ ২০১৮)। বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই ধরণের প্রবৃদ্ধিকে সাধারণত 'উন্নয়ন' বলে বলা হলেও তার সুফল সকলে সমানভাবে ভোগ করে তা নয়। তদুপরি এই ধরণের প্রবৃদ্ধি সমাজের শ্রেণী বিন্যাস বদলে দেয় এবং তার প্রভাব পরে রাজনীতিতে।

নতুন শ্রেণী বিন্যাস এবং রাজনীতি

বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধির ফলে আপাতদৃষ্টে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব তথ্য আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। এই নিয়ে উৎসব আয়োজনের কথাও আমরা জানি। বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের গচ্ছিত রাখা অর্থের পরিমাণ, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশীদের সেকেন্ড হোমের সংখ্যা এবং ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) তৈরি করা হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ এই সবই বাংলাদেশে বিত্তবানদের সংখ্যা এবং সম্পদের প্রমাণ দেয় (রীয়াজ ২০১৭)। এ কথাও আমরা জানি যে, প্রবৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

কিন্তু এই সব তথ্যের পাশাপাশি যদি আমরা অন্যান্য তথ্য বিবেচনায় নেই তবে যে চিত্র আমরা পাই তা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে এই প্রবৃদ্ধির সুবিধা কারা ভোগ করছেন। প্রথমত সাধারণ মানুষের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্প্রতি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের কর্মীদের প্রকৃত আয়ের যে সূচক প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, 'অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মজুরি ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ সময়ে বেড়েছে ২৪.৭ শতাংশ। কিন্তু এ সময়ে ভোক্তামূল্য সূচক বেড়েছে ৩২.৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১০-১১-এর তুলনায় শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমেছে ৭.৯ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার দাবি করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তাদের আয়-বৃদ্ধি থেকে শুধু বঞ্চিত হয়নি, বরং তাদের আয়ও হারিয়ে যাচ্ছে' (তিতুমীর ২০১৮)। দ্বিতীয়ত, সম্পদ জমা হচ্ছে এক ছোট গোষ্ঠীর হাতে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১৬ অনুযায়ী 'দেশের সব মানুষের যত আয়, এর মাত্র ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ আয় করেন সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষ। ছয় বছর আগেও মোট আয়ের ২ শতাংশ এই শ্রেণির মানুষের দখলে ছিল। অন্যদিকে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় বেড়ে মোট আয়ের ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। ছয় বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ৩৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। জরিপে দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের মালিক ওপরের দিকে থাকা ৩০ শতাংশ মানুষ। এই ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে জিনি সূচকে। আয়বৈষম্য নির্দেশক জিনি সূচক ২০০০ সালের দশমিক ৪৫১ থেকে ২০১৬ সালে দশমিক ৪৮৩ হয়েছে' (তিতুমীর ২০১৮)। তৃতীয়ত এই ধরণের উন্নয়ন বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, প্রকৃত বেকার মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৪৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। ব্যুরোর আরেক জরিপ অনুযায়ী ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ দুই বছরে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৮ লাখ। দেশের সব তরুণের স্বপ্ন যে বিসিএস পরীক্ষায় সফল হওয়া তাঁর কারণ হচ্ছে তাঁরা অন্যত্র আর কোনো সুযোগ দেখতে পান না।

এই যে উন্নয়নের ধারা তার নেতিবাচক দিকের সবচেয়ে বড় প্রকাশ দেখতে পাই ব্যাংকিং খাতে; ব্যাংকিং খাতের অবস্থাকে জনগণের অর্থে ফুটো চৌবাচ্চা ভরার এক প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই বলার অবকাশ নেই (রীয়াজ ২০১৮)। কেননা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে সরকার ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত আট বছরে ১৪ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা দিয়েছে। আর অন্য দিকে ২০১৮ সালের প্রথম তিন মাসেই খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। '২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ ছিল ৭৪ হাজার ৩০৩ কোটি ১১ লাখ টাকা। চলতি বছরের মার্চ শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮ হাজার ৫৮৯ কোটি ৩৭ লাখ টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আদায় অযোগ্য হয়ে পড়ায় ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলাভুক্ত হয়েছে ৫৫ হাজার ৩১১ কোটি টাকার অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ। এ ঋণ যোগ করলে দেশের ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে' (বণিক বার্তা ২০১৮)।

বিরাজমান উন্নয়নের ধারা যে সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা তৈরি করেছে তার ফলে বিত্তবান শ্রেণীর পাশাপাশি 'চুইয়ে পড়া'র মতো করে এই সম্পদের কিছু সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটিয়েছে, যারা বিত্তের বিবেচনায় মধ্যবিত্ত বলে বিবেচিত হলেও আচার-আচরণে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিবেচনায় অতীতে মধ্যবিত্ত যে ধরনের ভূমিকা পালন করত, তা পালনে আগ্রহী নয় (রীয়াজ ২০১৭)। বাংলাদেশে অতীতে মধ্যবিত্তের ভেতরে গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা এবং অংশগ্রহণমূলক সমাজের স্বপ্ন ছিল, এখন তা প্রায় অবসিত। 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বাধীন গণমাধ্যম, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ও অর্থ বরাদ্দে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, স্বাধীন নির্বাচনব্যবস্থা, স্বাধীন বিদ্যাচর্চা-সংস্কৃতিচর্চা' এদের কাঙ্খিত নয় (মুহাম্মদ ২০১৮)। এই শ্রেণী যে বিরাজমান হাইব্রিড রেজিমের রাজনৈতিক এজেন্ডার পক্ষে থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক, তাঁদের অস্তিত্ব কার্যত নির্ভর করছে এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার সঙ্গে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান দুর্নীতি এবং লুণ্ঠনের প্রক্রিয়াকে বৈধতা প্রদানের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে এই নতুন শ্রেণী। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা বিবেচনা করলে বলা যায় যে, আগামীতে যেকোনো ধরনের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে এই শ্রেণী ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই নতুন ধনিক শ্রেণীর উদ্ভবের আলোচনায় আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীনদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এই ধরণের সুযোগ সুবিধা লাভ সম্ভব নয়। তার অর্থ হচ্ছে, এই ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর মানুষ যারা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তাঁরা যে কেবল সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছেন তাই নয় তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন, ফলে অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই শ্রেণীর মানুষেরা এক ধরণের অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলেই অবস্থান নেবেন।

রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের প্রভাব

বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের উপস্থিতি এবং প্রভাব নতুন কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলাম সবসময়ই এক ধরণের ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু গত কয়েক দশকে সমাজ জীবনে ইসলামের দৃশ্যমান উপস্থিতি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের ইসলামীকরণ গত এক দশকে যতটা ঘটেছে আগের কোনো সময়েই তা ঘটেছে বলে মনে হয় না। পোশাক-আচরণ-দৈনন্দিন জীবনাচারণ-কথোপথন এগুলোর দিকে তাকালেই সমাজে ও সংস্কৃতিতে ইসলামী ভাবধারার ব্যাপক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। (বিস্তারিতভাবে আলোচনার জন্যে দেখুন, রীয়াজ ২০১৭এ)। যা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত তা হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজে

দীর্ঘদিন ধরে যে স্থানীয় ও সমন্বয়বাদী (সিনক্রেটিক) ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভাব ছিলো বলে ধারণা করা হতো তাঁর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, বিপরীতক্রমে একটি রক্ষণশীল আক্ষরিক (লিটারালিস্ট) ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গে একটি বৈশ্বিক ব্যাখ্যার ইসলামেরই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

সমাজে ইসলামের এই প্রভাব এবং এক বিশেষ ধরণের ব্যাখ্যার প্রতি জনসাধারণের সম্মতির একটি কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতি পক্ষপাত, অন্যদিকে তা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের মানস গঠনে বড় ধরণের পরিবর্তন। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় এই পরিবর্তনের সূচনা হয় কার্যত ১৯৭৪ সালেই, তবে সত্তরের দশকের মাঝমাঝি থেকে বিভিন্ন ঘটনা তাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে। এর মধ্যে আছে ক্রমান্বয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপরে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অপসারণ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সেক্যুলারিজমের/ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান, রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলের আবির্ভাব, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি এবং দল-নির্বিশেষে ধর্মীয় প্রতীক ও রেটরিকের ব্যবহার। নব্বইয়ের দশক থেকে ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের ইসলামপন্থী দলের সংস্কারবাদী, রক্ষণশীল, উগ্রপন্থী, সহিংস চরমপন্থী বিকাশ লাভ করে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে সংবিধানে পুনঃস্থাপন করলেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থেকেছে, এবং ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার কোনো লক্ষণই আর উপস্থিত নেই। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ধরণের ইসলামপন্থী জঙ্গী সংগঠনের উপস্থিতি ঘটতে শুরু করে।

অন্য যে কোনো মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মতোই বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা উপস্থিত ছিলো এবং আছে। যদিও দীর্ঘদিন বাংলাদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ইসলামপন্থী রাজনীতি বলতে কেবলমাত্র বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামকেই বিবেচনা করেছেন। এই রাজনীতি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হলেও প্রবণতার দিক থেকে আমরা একে দুইভাগে ভাগ করতে পারি তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল এবং সংস্কারপন্থী। গত কয়েক বছরে, বিশেষত ২০১১ সালের পর থেকে, বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের মধ্যেকার তুলনামূলকভাবে সংস্কারপন্থী ধারা দুর্বল হয়েছে; অতীতের ভুল রাজনীতি, সাংগঠনিকভাবে ভুল সিদ্ধান্ত, বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি তাঁর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল এই সংস্কারপন্থীদেরকেই তাঁদের চ্যালঞ্জ বলে বিবেচনা করায় এই ধারাটিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলার চেষ্টা করেছে এবং তাতে বড় ধরণের সাফল্য অর্জন করেছে। এই জন্যে শক্তি প্রয়োগ, বিচারিক ও বিচার-বহির্ভূত ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়েছে এবং সিভিল সোসাইটির একটি অংশ ও গণমাধ্যম তাতে অংশ নিয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে দলগতভাবে জামায়াতে ইসলামী কার্যত বিপর্যস্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু আদর্শিকভাবে ইসলামপন্থার আবেদন হ্রাস পায়নি, ইসলামপন্থীদের শক্তিও খর্ব হয়নি।

ইসলামপন্থীদের সংস্কারপন্থী বলে পরিচিত অংশের অনুপস্থিতির সুযোগে গত কয়েক বছরে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীরা রাজনীতির প্রান্তিক অবস্থান থেকে রাজনীতির কেন্দ্রে আসতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীরা কেবল শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা নয়, তাঁরাই এখন রাজনীতির এজেন্ডা নির্ধারণের মতো শক্তি রাখেন। এই রক্ষণশীল ধারার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হচ্ছে হেফাজতে ইসলাম। হেফাজতে ইসলামের উত্থান, তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের সঙ্গে সব রাজনৈতিক দলের সখ্যের আগ্রহ, ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠতা এবং এই গোষ্ঠীর দাবি দাওয়া মেনে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের দ্বিধাহীনতা প্রমাণ করে যে এখন বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনীতির প্রধান প্রতিনিধি তারাই। তবে মনে রাখা দরকার যে, তাঁরাই এই ধারার একমাত্র প্রতিনিধি নয়, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

ক্ষমতাসীন দল গত দুই/তিন বছরে এই শক্তিকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এটিকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, বাস্তবোচিত পদক্ষেপ, জনসাধারণের মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কৌশল, কো-অপটেশন - যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন এতে করে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে কট্টর রক্ষণশীল ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং রাজনীতিতে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আসন্ন জাতীয় সংসদের নির্বাচন যদি সকল দলের অংশগ্রহণমূলক হয় তবে প্রধান প্রধান দল বা জোটের কাছে ইসলামপন্থী দলগুলো গুরুত্ব পাবে, সেই গুরুত্ব ভোটারদের মধ্যে তাঁদের সমর্থনের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশিই হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রধান জোটগুলো তাঁদের ইসলামী পরিচিতিকে প্রাধান্য দেবার জন্যেই এই ধরণের দলের দ্বারস্থ হবেন। এই প্রভাবের মাত্রা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে যদি এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে বিএনপি এবং অন্যান্য পরিচিত দল অংশগ্রহণ না করে। কেননা নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক হিসেবে উপস্থাপন, তৃণমূল পর্যায়ে ভোটারদের মোবিলাইজ করা এবং একপাক্ষিক নির্বাচনকে দৃশ্যত বৈধতা দেয়ার জন্যে ইসলামপন্থীদের প্রয়োজন দেখা দেবে। এই রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করার রাজনৈতিক উদ্যোগ এখনও অনুপস্থিত, আর আদর্শের লড়াইয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের চেষ্টার পরিণতি ইতিবাচক হয় না।

ভারতের ভূমিকা

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও নিকট প্রতিবেশী হিসেবে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার কারণে ভারত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব সময়ই একটা 'ফ্যাক্টর' হিসেবে উপস্থিত থেকেছে। যদিও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে-ভারত সম্পর্ক সব সময়ই ছিলো 'অম্ল-মধুর' তথাপি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত প্রসঙ্গ উপস্থিত থেকেছে আলাপ-আলোচনায়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। অযৌক্তিক ও উগ্র ভারত-বিরোধী এবং ভারতের প্রতি অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল ও ভারত বিষয়ে স্পর্শকাতর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে সব সময়ই ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিবেচনা করার প্রবণতাই প্রধান ধারা।

একথা সাধারণের কাছে স্পষ্ট যে, ভারতের পক্ষপাত সব সময়ই আওয়ামী লীগের অনুকূলে ছিলো। অন্যদিকে বিএনপি'র রাজনীতির একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে ভারত-বিরোধিতা। ভারতের নীতি নির্ধারকরা স্ট্র্যাটেজিক বিবেচনায় বাংলাদেশকে তাঁদের পেছনের উঠোন বা ব্যাকইয়ার্ড বলে বিবেচনা করে এসেছেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হতে পারে এমন যে কোনো কিছুকেই ভারত মোকাবেলা করার তৎপর থেকেছে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতির ব্যাপারে ভারতের উৎসাহ কেবলমাত্র উৎসাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

অতীতে ভারতের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব সীমিত থাকার কারণে এবং বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহ ও নির্বাচনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার ফলে ভারত প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পর্দার আড়ালে ভারতের নীতি-নির্ধারকরা তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি করে (মুখার্জী ২০১৭) এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অনুকূলে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা নেয়, তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের বাংলাদেশ সফরই কেবল তাঁর প্রমাণ নয়, এই একপাক্ষিক নির্বাচনের পরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমালোচনার বিরুদ্ধে ভারত বাংলাদেশ সরকারের বর্ম হিসেবেই কাজ করেছে। গত কয়েক বছরে ভারত বাংলাদেশের সরকারের কাছ থেকে যা পেয়েছে তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় 'সারা জীবন মনে রাখবার' মত (বাংলা ট্রিবিউন ২০১৮)। কিন্তু বিনিময়ে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যে তার প্রাপ্যও পায়নি সেটা এমন কি ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেন।

২০১৮ সালে এসে চার বছর আগের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। ভারত বাংলাদেশে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র সরকার চায় চারটি কারণে; প্রথমত বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবেলা; তৃতীয়ত দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের মিত্রের অভাব এবং চতুর্থত ইতিমধ্যে ভারতের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হয়েছে তা রক্ষা করা। ফলে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির ব্যাপারে এখন ভারতের আগ্রহ বেশি। এই আগ্রহ এবং সেই মর্মে সক্রিয় থাকার কারণে এটা এখন আরো স্পষ্ট যে ভারত বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের ও সেই সূত্রে বাংলাদেশের রাজনীতির এক নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদের ভারত সফর, মে মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শান্তি নিকেতনে নরেন্দ্র মোদির আলোচনা বিষয়ে আনন্দবাজারের প্রতিবেদন (চট্টোপাধ্যায় ২০১৮), জুন মাসে বিএনপি প্রতিনিধি দলের নয়া দিল্লী সফর এবং জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের সফর এই ইঙ্গিতই দেয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রভাবকে কেউ আর অস্বীকার করছেন না।

বিএনপির প্রতিনিধিদের ভারত সফর যতটা দৃষ্টিকটুই হোক না কেন, দলের ভারত-বিরোধিতার নীতির পরিত্যাগের আন্তরিকতা নিয়ে যত প্রশ্নই উঠুক না কেন এবং এতে আদৌ ফলোদয় হবে কিনা সেই বিষয়ে যত সংশয়ই থাকুক না কেন, এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ভারতের প্রভাব স্বীকৃত হল তেমনি আরেকটি প্রশ্নও উত্থিত হল - যারা ভারত-বিরোধিতার জন্যে বা ভারতের সঙ্গে অসম সম্পর্কের বিরোধী শক্তি হিসেবে বিএনপিকেই বিবেচনা করতেন বিএনপি'র সেই সমর্থক গোষ্ঠী কোথায় আশ্রয় নেবে? (আহমেদ ২০১৮)। বাংলাদেশের রাজনীতির আগামী দিনে এই গোষ্ঠী কোন পথে অগ্রসর হয় তা লক্ষ্য করার বিষয়।

গত বছরগুলোতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের মাত্রা ও প্রকৃতি বাংলাদেশে ভারতের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে কিনা সেই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত আমাদের হাতে নেই, কিন্তু অব্যাহতভাবে এই প্রভাব বিস্তার দীর্ঘ মেয়াদে ভারতের জন্যে ইতিবাচক হবে বলে মনে করার কারণ নেই। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের উদাহরণ এ ক্ষেত্রে ভারতের নীতি নির্ধারকদের বিবেচনা করা দরকার।

উপসংহার

বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার জন্যে আমি এই প্রবন্ধে চারটি বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছি। প্রথমত বর্তমান শাসন ব্যবস্থা, যাকে আমি হাইব্রিড রেজিম বলে বর্ণনা করেছি এবং যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃশ্যত গণতান্ত্রিক উপাদানের পাশাপাশি শক্তিশালী কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার উপস্থিতি এবং শাসন পরিচালনার জন্যে শক্তি প্রয়োগের ওপরে নির্ভরতা। এই ধরণের শাসন ব্যবস্থা স্থিতাবস্থায় থাকেনা বলেই পৃথিবীর অন্যত্র দেখা গেছে; সেসব ক্ষেত্রে আরো বেশি ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং আরো বেশি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের জন্যেও সেটা বিবেচ্য হওয়া দরকার। এই ধরণের শাসনের বৈধতা ক্ষমতাসীনদের পরিকল্পিত নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি হয় যাকে তাঁরা এক ধরণের আনুষ্ঠানিকতা বলেই বিবেচনা করেন। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সমাজে এক নতুন শ্রেণী বিন্যাস ঘটেছে এবং নতুন ধণিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রের আনুকূল্যে ও ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই শ্রেণীর মধ্যে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার আকাঙ্খার ঘাটতি আছে, যা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে। নিকট ভবিষ্যতের জন্যে তা ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়া না। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধা বঞ্চিতদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হওয়াই স্বাভাবিক। তৃতীয়ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের প্রভাব বেড়েছে। আগামীতে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির ক্ষেত্র যতই সীমিত হবে, এই শক্তির প্রভাব ও ক্ষমতা বাড়বে। সকলের অংশগ্রহণমূলক অবাধ নির্বাচনের বিকল্প কিছু চেষ্টা করা হলে এই শক্তিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। চতুর্থত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত প্রায় নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা কার্যত সব প্রধান দলই স্বীকার করে নিয়েছে; কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বলে যে এতে করে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের লাভবান না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

তথ্যসূত্র

ইংরেজী

Bogaards, Matthijs. 'How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism', *Democratization*, 16 (1), 2009, pp.399-423.

Diamond, Larry. 'Thinking about Hybrid Regimes', *Journal of Democracy*, 13(2), 2002, pp. 21-35.

Ekman, Joakim. 'Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes', *International Political Science Review* 30(1), 2009, pp 7-21.

Fishman, Robert M. "Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy", *World Politics*, 42(3), 1990. pp. 422-440

Freedom House, 'Methodology', *Freedom in the World 2012*, https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/methodology).

Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991.

Levitsky, Steven and Lucan Way. 'The Rise of Competitive Authoritarianism', *Journal of Democracy*, 13(2), 2002, pp. 51-65.

Mahmud, Wahiduddin. 'How democracies die and economies grow,' *The Daily Star*, June 11, 2018.

Mukharjee, Pranab. *Coalition Years: 1996-2012*, New Delhi: Rupa Publications, 2017.

O'Donnell, Guillermo and Philippe Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

Riaz, Ali. *Lived Islam and Islamism in Bangladesh*, Dhaka: Prothoma, 2017.

Schedler, Andreas. 'The Logic of Electoral Authoritarianism' in Andreas Schedler (ed), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder, CO: Lynne Reiner, 2006.

Schmitter,Philippe C. and Terry Lynn Karl,'What Democracy Is. . . And Is Not', *Journal of Democracy*, 1991, 2(3), 1991, pp. 3-16.

Sobhan, Zafar. 'There can be only one.' *Dhaka Tribune,* 1 January 2015, http://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2015/01/01/there-can-be-only-one/

বাংলা

আহমেদ, কামাল। "চমৎকার' নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ!' *প্রথম আলো*, মে ২০, ২০১৮

আহমেদ, মহিউদ্দিন। "ভারত ফ্যাক্টর এবং বিএনপির তীর্থযাত্রা,' *প্রথম আলো*, জুন ২০, ২০১৮

চট্টোপাধ্যায়, অনমিত্র। "দিল্লির পাশে থেকেছে ঢাকা, মোদীর কাছে 'প্রতিদান' চান হাসিনা,' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, মে ২৬, ২০১৮

তিতুমীর, রাশেদ আল মাহমুদ। 'হারাচ্ছে প্রবৃদ্ধি, হারাচ্ছে একটা প্রজন্ম', *প্রথম আলো*, জুন ১৪, ২০১৮

বাংলা ট্রিবিউন। 'ভারতকে যা দিয়েছি সারা জীবন মনে রাখবে: শেখ হাসিনা', মে ৩০, ২০১৮

বণিক বার্তা। '৩ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকা', জুন ৪, ২০১৮

মুহাম্মদ, আনু। 'লুম্পেন কোটিপতিদের উত্থানপর্ব', *প্রথম আলো*, মার্চ ২৮, ২০১৮

রীয়াজ, আলী। *ভয়ের সংস্কৃতি: বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৪।

রীয়াজ, আলী। 'জনগণের অর্থে ফুটো চৌবাচ্চা ভরা', *প্রথম আলো*, মার্চ ৩০, ২০১৮

রীয়াজ, আলী। 'বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন', *প্রতিচিন্তা*, অক্টোবর ২০১৭

Centre for
Governance Studies

45/1 New Eskaton, 2nd Floor, Dhaka 1000, Bangladesh

সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ